অথৈ

রুম্মান মাহমুদ

প্রিয় অথৈ,

দেখতে দেখতে চারটা বছর কেটে গেলো। এই চার বছর তোমার কাছে চার যুগের মতো দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর ছিল। জানি। তুমিও বোঝো এই সময়টা আমার কাছে একটা চড়ুই পাখির উড়ালের মতোই ছিল। আমার সময় চিরকালই বেখেয়ালে উড়ে গেছে অন্তহীনতার দিকে। কিছু ঝড়ের ঝাপ্টা কেবল রেখে গেছে মনে মগজে।

যাই হোক, পুরানো চালে ভাত বাড়াই। দুই হাজার আটে মোবাইল স্ক্রীনে দুই চোখ লেপ্টে হাঁটতে গিয়ে তোমার সাথে ধাক্কা এবং ঝগড়া। টাটকা বাংলা সিনেমার ফ্লেভার। দুই দিন পরেই অরিয়েন্টেশান ক্লাসে আবিষ্কার করি এই বিরক্তিকর মেয়ে আমার ক্লাসমেট। আমার আগের জন্মের পাপ হিশেবে তোমাকে মেনে নেই। ক্লাস চলছিল আমাদের। উপেক্ষাও। ডিপার্টমেন্টাল ট্যুরের অর্গানাইজার হতে গিয়ে টুকটাক কথা ও টাকার আদানপ্রদান হল। কবিতার ক্লাসে রুদ্র'কে নিয়ে একচোট মারামারি হল। কবিতা যে তুমি ঘোড়ার ডিম বোঝো সেদিনই বুঝেছিলাম। ফার্স্ট টার্মের এক্সামের ঠিক একমাস আগে কিছু প্রশ্নের নোট করে যেন বাকিদের একটু দেই এইরকম আবদারে আমি খুব বিপর্যস্ত, বিব্রত। শ্যামলের সাধু কালাচাঁদ যার মগজে গেঁথে আছে সে কিনা বিগত বছরের প্রশ্ন ঘেঁটে ঘেঁটে নোট করবে? এই সুযোগে তুমি হিট। ফটোকপির দোকানে দোকানে তোমার হাতের লেখা ঝুলছে। সবাই পীর মানছে তোমাকে। আমি রইলাম অন্য পৃথিবী নিয়ে। পরীক্ষার রেজাল্ট দিলে দেখি তুমি ফার্স্ট, আমি থার্ড। মাঝখানে আছে এক ছাগলের তিন নাম্বার বাচ্চা। বুঝলাম, এই ডিপার্টমেন্টে বিশেষ কোন পড়ালেখা করা ছাড়াই আমার থার্ড হয়ে যাওয়ার একটাই মানে, বাকি সহপাঠিরা আমার চেয়েও বড় বেকুব অথবা ফাঁকিবাজ। সুনীলের "পথ ভুল করে চলে এসেছি পিঁপড়েদের দেশে" টাইপের ব্যাপারও ছিল কারো কারো। অবশ্য অনেকেরই অন্য কিছুতে দখল ছিল দেখার মতো। নীরব ভালো গান গাইতো, অরিত্র চমৎকার বাঁশি বাজাতো। রাত ঘনালে কিরণ এডাল্ট জোকসের ঝাঁপি খুলতো। পহেলা বৈশাখ আর বসন্ত উৎসব এলেই দিয়ার নাচের মুদ্রায় ক্যাম্পাস মেতে উঠতো। আমার দখল ছিল কেবল আড্ডা দেয়ার আর চা খাওয়াতে। ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক লেখালেখি। সবসময় বলতাম, পৃথিবীতে দু'দল মানুষ আছে, যারা খারাপ আর যারা চা খায়। উল্টাটা বলতে তুমি। চা খেতে না, এখনো তেমন খাও না। আমাদের এইসব বৈপরীত্যই হয়তো আমাদেরকে একই গর্তে হোঁচট খেয়ে পড়তে বাধ্য করেছে।

আচ্ছা, মাত্রই খেয়াল করলাম। উপরের অংশে এখন অব্দি যা লিখলাম সবই ট্র্যাশ, তুমি এই সবকিছুই জানো। আজকে আমি অন্যগল্প লিখতে বসেছিলাম। যে গল্পে তুমি আছো, অথচ তোমার জানা নাই। আমি না হয় পয়েন্ট দিয়ে লিখি, টিপিক্যাল ভালো স্টুডেন্ট তুমি। বুঝতে সুবিধা হবে।

এক.

ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকের কথা। হাফ লিটারের একটা কোকের বোতল দিয়ে ট্রুথ অর ডেয়ার খেলছিলাম অন্য ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন বন্ধুর সাথে। আমাদের মধ্যে কায়েস খুব সাহসী ছেলে। ধুমধাম মারামারিতে তার খুব নাম আছে। আমার কাছে 'ডেয়ার' নিয়ে ধরা খাওয়ার মুহূর্তে দেখলাম তুমি ক্যান্টিন থেকে আরো তিনটা মেয়ের সাথে পকপক করতে করতে বেরুচ্ছো। কায়েসকে বললাম তোমাকে প্রপোজ করতে। অবাক হয়ে দেখলাম সে নার্ভাস হয়ে গেলো, বললো অন্য কিছু দিতে। আমি জোর দিয়ে বললাম, না, এইটাই করতে হবে। এবং ফোন নাম্বার নিয়ে আসতে হবে। সে গেলো, লাল হয়ে ফিরে এলো। হঠাৎ তার চেহারা দেখে টের পেলাম, গাধাটা আসলেই তোমাকে পছন্দ করতো।

যাই হোক, ফোন নাম্বার সেদিনই অন্যভাবে জোগাড় হল। ভাবলাম একটা শাস্তি দেয়া তো অনিবার্য। ফন্দি আঁটলাম। রাতে কল করে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে ভারী কণ্ঠে বললাম, আমি ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমার আজিজ স্যার বলছিলাম। তুমি আতংকিত গলায় বললে, জ্বি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমি বললাম, আগামীকাল সকাল আটটায় শিউলি ম্যামের রুমে গিয়ে বলবে আমার সাড়ে আটটার ক্লাসটা যেন উনি নিয়ে নেন। মনে থাকবে? তুমি হড়বড় করে বললে, জ্বি স্যার, অবশ্যই মনে থাকবে স্যার। আজীজ স্যারের মতো একটা বিশালাকৃতিক্স যম তোমাকে এই কাজে কেন ফোন দিল এই চিন্তাটাই তোমার মাথায় আসে নি।

পরের দিন জীবনে প্রথম তোমাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। লনে দাঁড়িয়ে। একা। খারাপ লেগেছিল।

কখনো বলিনি তোমাকে। ভয়ে।

দুই.

শ্বশুরমশাইয়ের কথায় আসি এইবার। তোমার বাবার সাথে প্রথম পরিচয়ের কথা এখনো স্পষ্ট মনে আছে আমার। আমার বাবা আমি জন্মানোর আগেই ফুটে গেছেন শুনে উনি মর্মাহত হলেন। কথা কিছুদূর হতে না হতেই উনি জিজ্ঞাসা করলেন আমার টিউশনির বেতন কত। তুমি আমি দুইজনই অপ্রস্তুত। যন্ত্রণার তো সে-ই শুরু। তাঁর তীব্র আপত্তির মুখে আমাদের বিয়েটাও হলো কতো ক্লাইমেক্স ঘটিয়ে!

তোমার বাবাকে চিরকালই আমার খচ্চর প্রকৃতির লোক বলে মনে হতো। যে পথটা তিনি রিকশায় আসতে পারেন সেই পথ দশজনের সাথে একসাথে বাসে ঝুলতে ঝুলতে আসেন। বাজারে পনের টাকার কাঁচা পেঁপে চৌদ্দ টাকায় পাওয়ার জন্য আধঘন্টার তর্ক আমার এখনো কানে বাজে। আমি তাই পারতপক্ষে তোমার বাপকে সবসময়ই এড়িয়ে চলেছি। এমনকি বিয়ের পরেও। রিকশায় আসলে বলেছি হেঁটে এসেছি। ছয়শো

টাকায় লুঙ্গি কিনে বলেছি তিনশো টাকায় কিনেছি। তারপরও তার মুখভঙ্গি দেখে মনে হয় উনি গেলে ফ্রিতে দিয়ে দিত দোকানদার। একদিন তো একটা শখের টেবিল ল্যাম্প এর দাম জিজ্ঞাসা করায় মুখের ওপর বিরক্ত হয়ে বলেছি, দাম নেয় নাই, আপনার নাম বলাতে এমনিতেই দিয়ে দিলো।

তোমার বাবাকে এই অপছন্দের করাটা যে তুমি টের পেয়েছ সেটা বুঝতে পারি। উনিও যে আমাকে দুই চোখে দেখতে পারেন না -এটাও জানো। কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার বাবাকে নিয়ে এতগুলা বকবক করাটা অন্য কারণে। দুই হাজার তের'র নভেম্বরের ঘটনা। অফিস থেকে ফিরছি। হাতে সদ্য পাওয়া স্যালারি। কলিগের কাছ থেকেও ধার নিলাম কিছু। মনে দুশ্চিন্তা। ম্যালেরিয়া আর রক্তসল্পতা তোমাকে আধমরা করে দিয়েছে। তিনদিন হলো হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছো। আম্মা লড়াই করে যাচ্ছেন একাই। আমার কিছু ঔষুধ কেনা চাই। শীতের কিছু কাপড়ও। বাকি টাকাটা দিয়ে কেবিনের বিল চুকাতে হবে। একটা শপিং মলের কাছাকাছি আসতেই অন্ধকারে ছয়জন মুখ রুমালে ঢাকা লোক ছুরি ধরে সব টাকা নিয়ে নেয়। আমি বোকার মতো ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে পেটের বামপাশে ছুরির ঘাই এসে লাগে। ব্যথায় হতাশায় অপমানে রাস্তায় বসে কেঁদে উঠি। হঠাৎ তোমার বাপ আমার নাম ধরে ডাক দিলেন। কোত্থেকে নাজিল হলেন কে জানে! আমাকে নিয়ে গেলেন ক্লিনিকে। ওয়াশ হলো, ছয়টা সেলাই হলো। পুরোটা সময় একটা কথাও বললেন না। বের হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কত গেল আমার। আমি অপরাধী কণ্ঠে বললাম, চল্লিশ। তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে ব্যাংকের বুথ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা তুলে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, টাকার ব্যাপারটা যেন বাসায় না জানাই। স্রেফ একসিডেন্ট হিশেবে চালিয়ে দেই সেলাইটা। যা গেছে, গেছে। খামোখা টেনশান বাড়িয়ে কাজ নেই। খুব শান্ত ভঙ্গিতে আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। নিরুত্তাপ, নিরুদ্বিগ্ন। মনে হল তোমার বাবাকে নয়, আমি এক শান্ত পাথর দেখলাম।

আমি আর বলিনি তোমাকে সেদিনের কাহিনী, তোমার বাবাও যে কখনো উচ্চারণ করেননি সেটা স্পষ্ট বুঝেছি। এরপর থেকে এই ভদ্রলোকের উপর যখনই মেজাজ খারাপ হয় আমি ওইদিনের কথা মনে করে সব হজম করে ফেলি।

তিন.

হজম করার লিস্টটা আমার বেশ বড়ই। কত গল্প কবিতা এভাবে গায়েব করলাম তার ঠিক নেই। আমি বেমালুম হজম করে ফেলি আমার-তোমার বার্থডে, আমাদের বিয়ের বর্ষপূর্তি -এইসব মহাগুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যগুলোকে। আমার ধারণা এইসবের জন্য আমার মা-ই দায়ী। উনি আমাকে ভুল সময়ে জন্ম দিয়েছেন। ডাইনোসর যুগের মানুষদের মতই আমি বুঝতে পারি না এইসমস্ত দিনের মাহাত্ম্য। আমার তো বেঁচে থাকটাই একটা মস্ত সমস্যা বলে মনে হয়।

তোমার সাথে মারমার কাটকাট প্রেমের প্রথম বছরে তোমার যেদিন জন্মদিন এলো সেদিন তুমি লাল অথবা গোলাপি রঙের একটা শাড়ি পরে আমার কাছে এলে। বললে, এই শাড়ি কেন পরেছ অনুমান

করতে। আমার মাথায় তখন বনবন করে কবিতা ঘুরছে। একটা কবিতার আটলাইন প্রসব করে মাঝখানে দুইটা লাইনের অপূর্ণতায় আমি অস্থির। তাই অন্যমনষ্ক ভাবে বললাম, তোমার বাবার বিয়ে, তাই শাড়ি পড়েছ। তুমি আমার কবিতা কুচি কুচি করে বাতাসে উড়িয়ে বললে তোমার জন্মদিনের কথা, বললে একটা কবিতা তোমাকে নিয়ে লিখতে। জীবনে প্রথম নিজেকে সুফিয়া কামালের মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো। একটা কবিতা লিখলাম ন্যাকান্যাকা টাইপ। তাতেই তুমি আইসক্রিমের মতো গলে পড়লে। আশেপাশের সবাইকে দেখাচ্ছো ওই অকবিতা। অথচ আমার ওই আটলাইনের মর্ম তুমি বুঝলে না।

দু'মাস গেলেই আমার জন্মদিন আসলো। সেদিন ক্যাম্পাসে না আসলে জানতেই পারতাম না আমার জন্মদিনের কথা। তুমি ঘটা করে কেক কাটলে। আমি বিব্রত। একটা ঘড়ি উপহার দিলে, দেখতেই মনে হয় দাম ঝরে ঝরে পড়ছে। অথচ আমি তো মোবাইলেই সময় দেখতে পারি। জীবনে একটা বাহুল্য জুটলো - এই ভেবে হাতে টানা দশদিন পরতে না পরতেই একদিন চুরি হয়ে গেল টঙের দোকান থেকে। তোমার খুব খারাপ লেগেছিল শুনে। আমার হাতেরও খারাপ লেগেছিল, দশদিনের অভ্যাস চুরির দুঃখে।

যাই হোক, হিস্ট্রি একই নিয়মে হেসেখেলে রিপিট হতেই থাকলো। পরের 'দিবস'গুলোতেও যতভাবে অযাচিত সারপ্রাইজ দেয়া যায় দিয়েছো। আমি অবাক হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা এবং ভান করেছি। অভিমান করেছো নিজের জন্মদিনে, বিয়েবার্ষিকীতে। আমি সেই ক্ষত ও ক্ষতি পুষিয়েছি কবিতায়, হাসি ঠাট্টায়।

কখনো ভাবিনি তোমাকে এইভাবে চিঠি লিখতে বসবো বিয়ের বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। যেরকম ভাবিনি তুমি আমাকে একদিন সত্যিই চমকে দিবে।

চার.

তুমি আমাকে অবশ্য সত্যি সত্যি চমকে দিলে একদিন। বিশ নভেম্বর, দুপুর দুইটায়। হঠাৎ জানালে বমি হচ্ছে। চিরকালের গাধা'র মতোই বললাম গলায় আঙুল দিয়ে বমিটা করে ফেলতে। ভালো লাগবে। পরে ঘটনার মাজেজা বুঝে দৌড়ে নিয়ে গেলাম ক্লিনিকে। জানলাম ঘর আলো করে আমাদের ছোট্ট অতিথি আসছে। জীবনে অতটা আনন্দের মুহূর্ত আর কবে পেয়েছি মনে করতে পারি না। শ্বশুরবাড়ি থেকে শুরু করে সারা শহর রীতিমতো মাইকিং করলাম আমাদের চড়ুইছানার কথা। আমার পাগলামি দেখে কলিগরা খুব হাসছিল। আমি এমনিতেই পাগল, তার ওপর প্রথম বাবা হ'বার অনুভূতি। ভাবা যায়!

যত দিন ঘনাতে লাগলো তোমাকে ভালোবাসার অনুভূতিটা আমার তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো। আগে যখন সারাদিনের অফিস থেকে এসে রাতে লেখালেখির টেবিলে বসতাম, তুমি চা এনে দিতে এক ফ্লাস্ক, সাথে অনর্থক চেঁচামেচি। আমি লিখতাম পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল তুচ্ছ করে, অফিসের ঘামগন্ধ-অপমান মুছে ফেলে। তুমিও ডুবে যেতে তোমার কাজে। কখনো মাথা বা কলমে শব্দ আটকে গেলে হেঁটে আসতাম বাহির থেকে। মাঝরাতে বেড়ালের পায়ে পায়ে ঘরে ফিরে দেখতাম তুমি অপেক্ষার ক্লান্তিতে

সোফায় এলিয়ে আছো। তোমার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা ছড়িয়ে আছে টি টেবিল জুড়ে। নিঃশব্দ স্যরি'তে খাতাপত্র গুছিয়ে রাখতাম। তোমাকে কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় এগিয়ে নিতাম। অবশ্য আম্মা ঘরে থাকলে এইসব দেখলেই তেড়ে এসে লাথি ঝাড়তেন।

কিন্তু এই দিনগুলাতে আমাদের অনাগত অতিথি আমার বেঁচে থাকার উলটপালট রুটিনটা অনেকটাই গুছিয়ে আনলো। তুমি ডিপার্টমেন্ট থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিবে নিবে করছ। আমি অফিস শেষ হতেই পড়িমরি করে উড়ে আসছি বাসায়। তোমাকে আনাড়ি হাতে চা করে দিচ্ছি। খাবার গরম করে দিচ্ছি। ইন্টারনেট ঘেঁটে ঘেঁটে বের করছি ভ্রুণের বেড়ে ওঠার গল্প। তোমার পেটে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছি নড়চড়ার শব্দ। কি নাম রাখা যায় আমাদের চড়ুইছানার তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। পঁচিশটা দীর্ঘতম সপ্তাহ পার হয়ে এসে জানতে পারলাম আমাদের মেয়ে আসছে। অনেক তর্কযুদ্ধের পর নাম ঠিক হলো রূপকথা। একপদের নাম, কিছু নেই আগেপরে। আমি বসে গেলাম রূপকথার জন্য পৃথিবীর সবচে' সুন্দর গল্পটা লিখবো বলে। আমার মেয়ে যখন বড় হবে, বড় বড় চোখে চারপাশ দেখবে অবাক বিষ্ময়ে, তখন আমি রাতের বেলা বিছানার পাশে বসে ওকে এই গল্প শোনাবো। মেয়ে অবাক হয়ে ভাববে, তার বাবা কত ভালো! কত বড়!

পৃথিবী আমাকে নিয়ে চিরকালই কানামাছি খেলেছে। অন্ধচোখে যখনই ফুল ভেবে যা স্পর্শ করেছি, রক্তে ভরে গেছে হাত। যখনই আনন্দ এসে কড়া নেড়েছে, দরজা খুলতেই দেখা পেয়েছি কান্নার। জানি না কেন এমন হয়। তুমি শেষদিন ডিপার্টমেন্টে গেলে। কনস্ট্রাকশনের কাজ চলায় নিয়মিত সিঁড়ি বন্ধ, নামতে গেলে একটা নড়বড়ে লোহার সিঁড়ি বেয়ে। পা ফসকে পুরো একটা তলা। তারপর হাসপাতাল। আমি দমবন্ধ ছুটলাম হাসপাতাল। জানলার ওপাশ থেকে তোমাকে দেখলাম। জানলাম, তুমি ঠিক আছো, দু'টো ফ্র্যাকচার আছে। আর রূপকথা, আমাদের রূপকথা চিরকালের রূপকথা হয়ে গেছে।

পাঁচ.
তুমি বেঁচে আছো অথৈ। শরীর শুকিয়ে কাঠ। নিজেকে ক্ষমা করতে পারো নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন মৃতের মতো ছিলাম ছিলাম। এখন নতুন আরেকটা চাকরি নিয়েছি স্রেফ ভুলে থাকার দায়ে। আমাদের কথা হয় না খুব একটা। কত কিছুকে ভাষা দিয়েছি এই জীবনে! তোমাকে সান্ত্বনা দেয়ার কোন ভাষা ছিল না আমার। জড়িয়ে ধরে কান্না করেছি কেবল। রূপকথার জন্য কেনা ছোট ছোট স্বপ্নের কাঁথা, নরম জুতারা তোমাকে ঘিরে আছে।

এরই মধ্যে আরো একটা মাস পার হলো। আমাদের বিয়ের দিনটাও এলো। তুমি না বুঝেই আমার লেখা পছন্দ করতে। যেভাবে আমি চিরকালই না বুঝে ভালবেসে গেছি তোমাকে। তোমাকে জীবনে প্রথমবারের মতো চমকে দিতে খুব ইচ্ছে করছিল। তাই এই দিনটা মনে রেখেই চিঠিটা লিখলাম। তোমাকে আগের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসি। আমার সমূহ অযোগ্যতা, আলস্য, পাগলামি আর অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়ার মতো তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। আমার রূপকথা চলে গেছে, বেহেশতের ফুল হয়ে ফুটে আছে

আকাশে। এই অন্ধ জীবনে তুমি ছাড়া আলো কোথায় পাই? তোমাকে হারানোর সামর্থ আমার নাই। তোমার হাসির শব্দ শুনি না বহুদিন। একটু স্বাভাবিক হও। একটু হাসো আজ। আমি না হয় তোমার কিছু খাতা কেটে দিলাম। না বুঝেই নাম্বার দিলাম দুই হাত ভরে।

শুভ বিবাহবার্ষিকী অথৈ! যুগ যুগ জিও!

ইতি,
তোমার খারাপ মানুষ